গল্পপুঞ্জ

প্রথম খন্ড

নজমূল হক চৌধুরী

সম্পাদনায়

এ টি এম ইনামুল হক

এমএ এমএড এমএম (১ম শ্রেণি)

সম্প্রীতি প্রকাশ

ভূমিকা

নজমূল হক চৌধুরী মূলত কবি। কিন্তু সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর সৃষ্টির দক্ষতা ও প্রাচুর্য প্রশংসনীয়। তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি হল খোঁপার ফুল, বাঁশিওয়ালা, মাল্যদান, বসন্তবরণ, কুল ভোলানো বাঁশি, ফুটন্ত যৌবন এবং শতাব্দীর সংলাপ। উক্ত গ্রন্থগুলির গল্প ও প্রবন্ধের সমষ্টিই হল এই গল্পপুঞ্জ ঃ প্রথম খণ্ড। নজমূল-গীতি প্রথম খণ্ড, নজমূল-কাব্য অখণ্ড এবং উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ডের পর তাঁর গদ্যসাহিত্যের একটি পরিপূর্ণ জগৎ এই গল্পপুঞ্জ প্রকাশিত হল।

"সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্প অনেকাংশে কম। বিভাগ-পূর্ব কালে মুসলিম কথাসাহিত্যিকগণ ছোটগল্প রচনাতে মনোনিবেশ করেছেন উপন্যাসের অনেক কাল পরে। এর কারণ বিচিত্রমুখী– তবে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কারণই প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ। নগরমনস্কতার ঐতিহাসিক বোধের অনুপস্থিতিও এর অন্তরালে সক্রিয় ছিল নিঃসন্দেহে।" বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/মুহম্মদ আবদুল হাই।

উপরোক্ত মন্তব্যটি দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায় যে, বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নজরুল ইসলাম, আবুল ফজল, আবু রুশদ, শাহেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মাহবুবুল আলম, মনির উদ্দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং শওকত ওসমানের নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখযোগ্য। বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আদর্শরূপ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা রবীন্দ্রামল নয়; সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরিবেশও এখন নতুন এবং ভিন্নতর। এই কথাটিকে স্মরণ রেখেই নমজূল হক চৌধুরীর এই গ্রন্থের রচনাগুলি সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করতে চাই।

নজমূলের গল্পে নগরমনস্কতার চেয়ে পল্লীমনস্কতা অধিক। এই মনস্কতা গ্রাম্য মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত জীবনের আশা-নৈরাশ্য, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, কামনা-বঞ্চনা এবং সাফল্য-বৈফল্যের বাস্তবমুখী ভাষারূপ। তাঁর গল্পে নগরমনস্কতা না থাকা নয়। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ এখনও যে কৃষিনির্ভর এবং মেঠোপথ বিস্তৃত প্রান্তরের জনাকীর্ণ জনপদ, তা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কি গল্পে, কি প্রবন্ধে কবি নজমূল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণধর্মী কথাশিল্পী। তাঁর ভাষার বোধ এবং অর্থনির্দেশের ভঙ্গিমা বুদ্ধিদীপ্ত। চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে তিনি নিরীক্ষণবাদী। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত গল্পগুলি হল– পরিচয়, একটি সনেট, নিষ্ফল অপেক্ষা, বৌ চুরি ইত্যাদি। নিরীক্ষণধর্মী গল্প– গতিরোধ, ভাগ্যবতী, অগ্নিশিখা, চড়ু ইভাতি, পিতার শাসন প্রভৃতি। একটি সনেট গল্পটি যুগশ্রেষ্ঠ অদ্ভূত সৃষ্টি।

নজমূলের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণধর্মী গল্প খোঁপার ফুল, মাল্যদান, পাত্র, বসন্তবরণ, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে জীবনের নানা জটিলতার মাধ্যমে মন, মানস এবং চরিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষকে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত গল্পগুলির সাহায্যে জীবনের অনুভূতি, বাস্তবতা, রূঢ়তা, গাম্ভীর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

It seems to me that Nazmul experiments people in the

laboratory of society with the help of feeling, reality, rudeness, gravity etc. to find out the goodness of God and the badness of the Devil, and what of the two is working in a greater extent, has been wished to determine.

সমাজকে বিশ্লেষণ করে তাঁর গুণ ও দোষ উদঘাটন করতঃ মনস্তাত্ত্বিক গল্প হল– ব্যবধান, চক্ষুলজ্জা, ছবি চুরি, কুল ভোলানো বাঁশি, সলিল সমাধি ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে নজমূল সমাজের সচেতন সমালোচক, বেতধারী প্রহারকারী শিক্ষক, অন্যায়ের প্রতি বিধাতার মত নিষ্ঠুর এবং ন্যায়ের প্রতি গৃহস্বামীর মত আশ্রয়দাতা। আমার মতে ব্যবধান, চক্ষুলজ্জা ও সলিল সমাধি এ যাবৎ বাংলাভাষায় লিখিত ছোটগল্পের জগতে শ্রেষ্ঠ সংযোজন। কুল ভোলানো বাঁশি গল্পের মমত্ববোধ এবং অনুতাপ যেকোন পাঠককে কাঁদায়। These short stories prove that Nazmul has a power of teachership over the society to dictact it to be refined and reformed itself, for becoming a peaceful dweeling place. He tells us, man must think of highness and greatness to keep God's creation existing well indeed, and it is man's obtained divine virtue.

নজমূলের গল্পগুলি পড়লে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, প্রভাতকুমার প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের গল্প পড়ে আত্মস্থ করেছেন। এমনকি বাট্রেণ্ড রাসেল, কিপলিং এবং মপাসাঁর গল্পও পড়েছেন ধ্যানী ছাত্রের মত। কিন্তু গল্প রচনায় শব্দচয়ন, প্রকাশভঙ্গি এবং গঠনের ক্ষেত্রে তাঁদের কারুর একক বৈশিষ্ট্য সক্রিয়ভাবে তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। গল্প রচনায় নজমূলের শিল্পীত্ব নির্ভুল, মৌলিক এবং স্বতন্ত্র। It proves that Nazmul went through all the renowned persons of short stories, but he imitated none, discovered a single, original and personal mode of writing and his device of making stories adaptable is praiseworthy.

নজমূল পটভূমি সৃষ্টিতে এবং বিষয়বস্তু বিন্যাসকরণে আন্তরিকভাবে দক্ষ। তাঁর জীবনের কষ্টোপার্জিত অভিজ্ঞতাই পথের নির্দেশ দিয়েছে। যেহেতু গল্পগুলি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষারূপ, সেহেতু এগুলি অকৃত্রিমভাবে উপভোগ্য হয়েছে। তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গি শৈল্পিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ। তাঁর রচনারীতি পাঠককে গল্পের শুরুতে মনোযোগী হতে বাধ্য করে। নজমূলের প্রতিটি গল্পের পরিসমাপ্তিতে একটি করে চমক আছে। এজন্য গল্পগুলি বার বার পড়তে মন চায়। যতই পড়ি, পুরাতন বোধ হয় না।

ধন্যবাদান্তে–
নূরুল আম্বিয়া চৌধুরী

সূচিক্রম

খোঁপার ফুল ৯
পরিচয় ১২
প্রলয়-শিখা ১৫
ঈমানের সান ১৬
কবি ও কাব্য ১৮
ব্যবধান ২০
সাহিত্যের কাজ ২৪
গতিরোধ ২৫
ছন্দ ও কবিতা ২৯
নিষ্ফল অপেক্ষা ৩১
বাঁশিওয়ালা ৩৫
পশুত্ব ৩৭
চক্ষুলজ্জা ৩৯
সাহিত্য রচনা ৪৩
গন্ধর্ব প্রসাদ ৪৫
মহাকাব্য ইনিডের শিল্পরূপ ৪৮
ভাগ্যবতী ৫৪
ওমর খৈয়াম ৫৯
অগ্নিশিখা ৬১
মহত্ত অর্জন ৬৬
মাল্যদান ৬৮
যৌবন একটি সত্তা ৭৪
একটি সনেট ৭৬
নজমূল-গীতি ঃ প্রথম খণ্ড ৮৪
কবির শিল্পীত্ব ৮৭
বৌ-চুরি ৯০
জ্ঞানের সাধনা ৯৪
পাত্র ৯৬
১০৩ জাতীয় সাহিত্য
১০৬ বসন্তবরণ
১১৪ স্রষ্টা ও সৃষ্টি
১১৭ চড়ুইভাতি
১২১ গ্রন্থ-আলোচনা
১২৩ রজনীগন্ধা
১২৫ সাহিত্যে রসোত্তীর্ণতা
১২৮ নিমন্ত্রণ
১৩২ বড় বৌ
১৩৮ নজরুল-কাব্যে করুণ রস
১৪২ কুল ভোলানো বাঁশি
১৪৫ ওমর খৈয়ামের রুবাই
১৫২ সলিল সমাধি
১৫৭ মানসী ঃ কবি প্রসঙ্গ
১৫৯ পিতার শাসন
১৬৪ নজরুলের বিদ্রোহীরূপ
১৬৬ বিনিদ্র রজনী
১৭১ কাব্যে বিশ্ববোধ
১৭৪ ঋষি কবি
১৭৮ ছবিচুরি
১৮৫ পরোপকার
১৮৮ The Flower of Chignon
১৯২ The Shame of Blindness
১৯৬ A Burning Heart
২০৩ Difference in Birth
২০৮ The Watery Grave
২১৩ A Bridegroom For Ramna
২২০ The Flute of Folkland

কবি নজমূল হক চৌধুরীর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

কাব্যগ্রন্থ

বাণীকুঞ্জ, রক্তরাগ, প্রেমাঞ্জলি, মিলন-পিয়াস, অপরিচিতা, বিলম্ব শরতে, বিস্মৃত কাহিনী, বিনিদ্র রজনী, প্রেমের গুলিস্তান, বধূ, মৌন মালতী, অহেতুক, গোকুলের বাঁশি, নজমূল-কাব্য অখণ্ড।

গীতিগ্রন্থ

গীত-গুলিস্তান, সুরের ভুবনে, সুরছন্দা, বীণা ও বেণু, মদিনার বুলবুলি, গীতালি, গীতিকুঞ্জ, গুলবাহার, গীতবীথি, কাব্যগীতিকা, নজমূল-গীতি প্রথম খণ্ড।

গল্প ও প্রবন্ধগ্রন্থ

খোঁপার ফুল, বাঁশিওয়ালা, মাল্যদান, বসন্তবরণ, কুল ভোলানো বাঁশি, ফুটন্ত যৌবন, শতাব্দীর সংলাপ, মন মুকুলের মৌ, গল্পপুঞ্জ প্রথম খণ্ড, The flower of chignon.

উপন্যাস

এক জোড়া নীল চোখ, কেশের কাঁটা, বাসনার উপবন, আংটি বদল, সর্ষে হলুদ বরণ বৌ, প্রেমিক বদল, চরিত্রহীন, কাবেরীর প্রেমমালা, উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড।

ইংরেজী

The Theme of Islam
The Discovery of Nazrul.

খোঁপার ফুল

ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গাধর। দোদুল অঙ্গে তার ভরা যৌবনের আক্রোশ। শুধু দুকূল প্লাবিত করেই ছাড়ে না। সিন্ধুবালার প্রেমাবেগে ডুকরে ওঠে শো শো আর্তনাদে।

আশ্বিন মাস পড়ল মাত্র। শিউলি ফুলের তোড়া নিয়ে প্রকৃতির কুঞ্জদ্বারে পা ফেলার ফুলেল প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। নদীর একূল ওকূল যৌবনোন্মুখ উচ্ছল জলের সাথে মুখরিত তরঙ্গকণ্ঠের যে একটা মাতামাতি, তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে জোয়ারের আত্মসংরক্ষণমূলক স্বভাবে। তরঙ্গের মালা যে দুকূল কণ্ঠে পরে প্রাণোচ্ছল গঙ্গাধর দুলও, কলকল শব্দ করত, প্রাণের ক্ষুধায় পাড় ভেঙে বিকট আওয়াজে আপন বক্ষকে শব্দায়িত করে রাখত, সে উন্মাদনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে।

আমি প্রত্যহ যেখানে বসে শিমুল গাছের ছায়ায় ভাবাবিষ্ট হয়ে গানের সুর খুঁজতাম, সুর দিয়ে ভাষাকে শাসন করতাম, ভাবের তন্ময়তায় পূর্বদিগন্তের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম, তার উত্তরপার্শ্বে আমাদের নিজস্ব জমিতে ছন ক্ষেতের চাষ হত। যখন ছনক্ষেত নদীর পাড়ের কাশবনের সাথে মিতালী পেতে একাকার হয়ে সাদা ফুল ফুটিয়ে নদীর বক্ষবাহিত শীতল হাওয়ায় দুলত, তখন আমি তন্ময়তাবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম অজ্ঞাতসারে। আমি যখন নিম্নশ্রেণীগুলিতে পড়তাম গ্রামের স্কুলে, স্কুল ছুটির পর বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে সারা দিনের কর্মক্লান্ত গরুগুলিকে ঘাস খাওয়ানোর দায়িত্ব পড়ত আমার উপর। নদীর পাড়ের বিশালাকার শিমুল গাছ দুটির ছায়ার নীচে বই খুলে বসতাম। গরুগুলি ছেড়ে দিতাম নদীর চরের কাশবনে, তারা মুক্ত মনে চরে বেড়াত, আর ক্ষণিক পর পর মাথাগুলি উচিয়ে আমাকে তাকিয়ে দেখত। আমি হারিয়ে গেছি না কি।

যেদিনের কথা বলছি, তখনও নদীর বুকে চর পড়েনি, কাশফুল সব ফোটেনি, ফোটার বিলাসী আয়োজন চলছে মাত্র। এখন আমি কলেজে পড়ি। জেলা সদরের শহর থেকে তিন মাস পর বাড়িতে এলাম। শিমুল গাছের ছায়ায় বসে আজ মনে হল, আমি অন্য কোন জনমে এখানে বসতাম। কণ্ঠ সেধে গান গাইতাম। স্রোতের ভাসা ও সুদূর পথ পেরিয়ে আসা কচুরিপানাগুলি ইঙ্গিতে বলে আমায় ডাকত– এস হে দুরন্ত, আমাদের মত করে যদি সাহস করে অকূলে ভাসতে পারো, তবেই তোমার গানের সুর ফুটবে। নদীর তরঙ্গ ঝঙ্কারের সাথে যে গানের সুরের একটা সমঝোতার মাখামাখি আছে, তা তুমি জানো? সাগরের নাগাল পেতে হলে যে নদীতরঙ্গে ভাসতে হয়, তা বোধ হয় তুমি জানো না।

বাঁশি বাজাতে পারতুম বলে শিমুলতলায় বসে থাকার একটা প্রমাণ সংবাদ পাঠানো ছাড়াই বিশেষ এক জনের কাছে পৌঁছতো। বাঁশির সুর শোনা মাত্রই সে ঘাটে এসে দাঁড়াত কলস কাঁখে। শ্যামের বাঁশি শুনে ব্রজের রাধা যে মল্লিকা যেমন আমার বাঁশি শুনে নদীকূলে এসে দাঁড়ায়, তেমনি গোকুল নাগরকে দেখার জন্য যমুনাকূলে আসত। সে রহস্য তখনও আমার জ্ঞানে ততটা স্পষ্ট বা ব্যাপক হয়নি।

গঙ্গাধরের বুক যখন জোয়ারের অধিক পানিতে উদার বিস্তৃত হয়ে উঠত, তখন স্রোতে নামত মন্দা। আর মল্লিকা চেয়ে থাকত একাগ্রচিত্তে কাঁখের কলস দুর্বাঘাসের উপর রেখে। সে শিউলিফুল মুঠি মুঠি ছিঁড়ে নদীর পানিতে অন্যমনস্কের মত ছিটিয়ে

অনুরাগ দেখাত! ফুলগুলি স্রোতের পাকে পড়লে ঘুরপাক খেত বেশ। তার চোখে চাওয়ার নেশা ধরে যেত, যেন সে ঘরে ফেরার কথা একরকম ভুলেই গেছে।

মল্লিকা আমার সহপাঠিনী ও প্রতিবেশিনী ছিল। গ্রামের স্কুলের বিদ্যার যখন ইতি ঘটল, বিদ্যাচর্চার দূর গমনের বন্ধনে পড়ে আমার ও মল্লিকার শাখাবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। বৃন্ত থেকে ফুল খসে পড়লে যেমন আর বৃন্তে সে ফেরে না, বাঁশি ফেটে গেলে যেমন বাঁশুরিয়ার অধর থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়, মল্লিকার কাঁখের কলসটি পাঁজরে তার বাহুবন্ধনে ঠিক থাকল কি না জানি না, কিন্তু বৃন্ত থেকে মল্লিকা ঝরে পড়ল বটে!

শুধু মল্লিকা কেন, শাখাবন্ধন খুলে গেলে কুঞ্জ যেমন ঝরাফুলের কথা ভুলে যায়, বসন্ত-বিতানে দক্ষিণা হাওয়া যেমন কাননবালার কথা ভুলে যায়, কবি-গীতিকাররা যেমন গায়ক পাখি কোকিলের কথা ভুলে যায়, তেমনি সুপরিচিত জন সুদূরে চলে গেছে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবে যায়। ক্রমে মল্লিকার কথা বিলকুল ভুলেই গেছি। সখি-সহচরীরাও জল নিতে এসে ডুবাডুবি খেলে সাঁতার কাটতে এলে, সন্ধ্যাবেলা নদীকূলে হাঁটাহাঁটি করতে এলে মল্লিকার প্রসঙ্গ পেরে আজকাল বড় একটা বাচালতা করে না। আমার জীবনে মল্লিকার অধ্যায় অসমাপ্তই রয়ে গেল।

মল্লিকা খেলার সাথী, পড়ার সাথী বা সমবয়সীদের এক সাথে করে হাসি-তামাশা, হই-হুল্লোড়, গল্প করা খুব একটা পছন্দ করত না। আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে, আমার কণ্ঠে উদাস ভৈরবী সুরের গান শুনলে সে কলস কাঁখে নদীর ধারে এসে দক্ষিণের ঘাটে নিশব্দে হিজল গাছটির ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকত। আমি যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে লজ্জা পেয়ে গান বন্ধ করে দিতাম, সে মিষ্টি একটি হাসি দেখিয়ে বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আর এমন সব ভাব দেখাত যে, সে যেন বলত, সুরের দড়ি দিয়ে বেঁধে যেহেতু আকুল করে নদীকূলে এনেছ, সুতরাং আরও গাইতে হবে। শাড়ির আঁচল, খোঁপার ফুল, দোদুল তনু আমার গানের ছন্দে দোল খেলে যেন কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বুঝিয়ে দিত— থামলে কেন?

যে দিনের কথা বলছি, সূর্য অস্তাচলে যাবার আয়োজন সমাপ্ত করল সবেমাত্র। গঙ্গাধরের উদার বক্ষের তরঙ্গে জোছনার চুন্নীপানা ও হীরণমালার ঝিলিক ঝিলমিল করছে। আমার অবস্থানের আশে-পাশে, নদীকূলের ঝোপে-ঝাপে, শিউলির তলে, বাবলার ঘন ডালে, পুকুরের ধারে, বাঁশবনে নিশিথিনী তার আঁধারের অঞ্চল পেতে দিয়েছে, কর্মক্লান্ত ধরণী নিদ্রার আয়োজন করছে। বনানীর সন্ধ্যাবাতি জোনাকিরা জ্বলছে।

আজ আমি শিউলিতলায় বসে। সন্ধ্যা উতরিয়ে যায়নি এখনও। দক্ষিণের শিউলি ঝরানো হাওয়া অল্প অল্প করে ঘুরপাক খেয়ে যেন পাহাড়ী কোন পরিচিত নটিনীর নৃত্যের তাল নিল। পাতাগুলি খঞ্জনির সুরে বেজে উঠল। ফুটন্ত শিউলি ফুলগুলির উপরে দক্ষিণা বাতাসের প্রসারিত নাড়ানিতে ডাল হতে এক-আধটা অঞ্জলির মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছিল। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ল বিস্মৃতির মল্লিকাকে। বাঁশিতে করুণ সুর ধরেছি মাত্র। গানের দোহার এখনও শেষ হয়নি—

তোমাকে চেয়েছি, আমি চাইনি তোমার মালা।

মালা দিয়ে ভুলে গেলে, তাইতো বেড়েছে জ্বালা।

পিছনে কত কালের, কত যুগের, কত জন্মের, কত এমন শুভ্রস্নিগ্ধ শুক্লাতিথির সুপরিচিত দুটি চঞ্চল পায়ের স্পর্শ যেন সহসা শিউলির গন্ধে চমক মিশিয়ে সমস্ত পরিবেশে আবেদন সৃষ্টি করে বসল। বুঝতেই পারলুম, মল্লিকার হরিণী-পায়ের বিচরণ! পায়ে আজ নূপুর নেই, মল নেই, শব্দ নেই, সঙ্গীত নেই।

মল্লিকা হয়তো চেয়েছিল, আজ আমি বহুদিন পর তাকে নাম ধরে ডাকব। বাঁশি বন্ধ করলাম। ফুরফুরে বাতাসে ডালের পাতা উড়ে যেভাবে লুকানো কাঁটাগুলির সূক্ষ্ম ধারের অগ্রভাগ বিকশিত হয়, তার পায়ের স্পর্শে সেভাবে আমার অভিমানের কাঁটাগুলি পূর্বেই শিহরিত হয়ে উঠেছে বেদনা খসা আবেদনে। শুধু পিছন ফিরে তাকালাম মাত্র কয়েকটিবার।

জ্যৈষ্ঠ মাসে চারদিক থেকে ধূলি উড়িয়ে ঈশান কোণের কালো মেঘ দমকা হাওয়ার দুন্দুভির তালে বৃষ্টিজল ঢাললে যেমন গঙ্গাধরের বুক ভরে উঠত, রূপালি ঢেউ টলমলিয়ে ঝিলিক হানত, উচ্ছলিত ফেনিল জোয়ারের তোড়ে কূল টগবগ করত, মল্লিকার যৌবনশাখা তেমনি দেখতে দেখতে দিন দিন রূপ-লাবণ্যের ফুলেল সুষমায় ভরে গেছে। এতদিনে তার যৌবনের প্রস্ফুটিত বিকাশ, মুখাবয়বের কান্তশ্রী, কুসুমী দোলন ঠিক যেন বর্ষাধারায় পূর্ণধৌত একটি দলমুক্ত গন্ধরাজ ফুলের মত। সেই মুহূর্তে বাংলার কোন কুঞ্জে বোধ হয় মল্লিকার মত পূর্ণফুটিত কুসুম দ্বিতীয়টি ছিল না।

মল্লিকার বিকাশোন্মুখ রক্তবর্ণ সে মুহূর্তে যদি পরিপক্ক শিউলী ফুলের মত ফেটে চারদিকে ছিটকে পড়ত, আর আকাশের গোধূলি-রঞ্জনের সাথে তা মিশে দিক-দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতে পারত, তাহলে পূর্ণিমার চাঁদ হিসেব করে বলতে পারত না যে, সে তখন পূর্বাকাশে না পশ্চিমাকাশে! শরৎ কালকে তখন বসন্ত বলে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

সে অভিযোগ করে বলল, বাঁশি শুনতে এলুম, তা বন্ধ করলে কেন? যে সুরে গাইতেছ, সে সুরটিই শুধু শোনাতে হবে। বাঁশি শোনার আজি শেষ আসরে যোগ দিতে এলুম, বাঁশি শোনাও।

আমি। পায়ে নূপুর কই? পায়ে নূপুর থাকলে বাঁশি বাজত। তারি সুরে ঝঙ্কার ফুটত। অন্তরের সমূহ ব্যথার জোয়ার নামত। কাল নূপুর পরে এস, বাঁশি শোনাব।

মল্লিকা। নূপুর আর আমি কোন দিনও পরব না।

আমি। আমার বাঁশিও আর কোন দিন বাজবে না।

মল্লিকা। বাঁশি না শুনে ঘরে ফিরব না।

আমি। তাহলে পাশে বস। পূর্ণিমার চাঁদের বাসর সাজিয়েছে আকাশ। উপভোগ করি।

মল্লিকা ক্ষীপ্ত হস্তে বাঁশি কেড়ে নিল আমার থেকে। খোঁপায় গোঁজা গন্ধরাজ ফুলটি টেনে খুলে ফেলে আমার কোলে ছিটিয়ে দিয়ে আর্দ্র কণ্ঠে বলল, এই নাও বাঁশির দাম। আর মনে রেখ, নূপুরের সমস্ত সুর তোমার প্রাণের শাখায় ঢেলে দিয়ে গেলাম। গানে-কবিতায় ঝরবে চিরদিন। জানতাম, তুমি আমার কাছে কি চাইতে। তোমার যতটি গান, যতটি কবিতা ফুটবে, আমি গন্ধ হয়ে, ছন্দ হয়ে, সুর হয়ে দূর থেকে ঝরে পড়ব। ভুলতে দেব না কোন দিন। তুমি এই বাঁশি বাজিয়ে আমাকে অনেক কাঁদিয়েছ। এবার আমাকে ভোলার ছলে তোমার গান গেয়ে কাঁদার পালা। তোমার অশ্রুর কাঁদনকূলে আমি চিরদিন কলস কাঁখে শিউলি ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি গন্ধ নিয়ে ছন্দ ঢেলে দিও।

সে কখন চলে গেছে আমি দেখিনি। নিমগ্ন ছিলাম। রক্তরাগের যে কবিতাটি লিখতে বসে আমি মল্লিকাকে স্মরণ করে সত্যিই কেঁদেছিলুম—

একটি মালার লাগি এতদিন পরে

এত সুর, এত বাণী, এত গান ঝরে।
সেদিন বুঝিনি কালা মালা লাগি এত জ্বালা,
মোর লাগি কত জানি আঁখি-বারি ঝরে!

আজ কোন ফুলের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। বোধ হয়, বাংলার সকল ফুলে মল্লিকার খোঁপার ফুলের ব্যথা গন্ধ মিশ্রিত– তাই।

মল্লিকা যেদিন বাঁশের বাঁশিটি নিয়ে চিরতরে বিদায় নিল, সেদিন থেকে আমার প্রাণের বাঁশি গানের সুরে বাজতে লাগল।

পরিচয়

ফাল্গুন মাস। শীতের পর প্রকৃতির দেহের শুকনো পাতার পুরাতন বসন খুলে ফেলে নতুন পাতার সবুজ বসনের সাথে আমের মুকুল, শিমুল ফুল দিয়ে আলোকলতার চুল বেণী গেঁথে নেওয়ার উৎসব চলছে। দক্ষিণা বাতাস শুকনো পাতার ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে, পিক-পাপিয়া-বুলবুলি আসর বসিয়ে বসন্তগীতি গাইছে। আম্র মুকুলের মৌ মৌ গন্ধে, শিমুল ফুলের আগুন বরণ রূপে এবং মান্দার ফুলের রক্তমাখা অনুরাগে মৌ-পিয়াসী প্রেমিক ভ্রমর কণ্ঠঝরা গুঞ্জরণে বনকূল যেন মাতিয়ে তুলছে। বসন্তের সমারোহে প্রেমবিরহী নিঃসঙ্গ আত্মায় যত আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি করে, সংসার-মুখর সুখী জনের অন্তরে ততটা উপলব্ধির সৃষ্টি করতে পারে না। এতে বুঝা যায়, বসন্তের হিল্লোলিত আবেদনের প্রকৃত যোগ বিরহী আত্মার সাথে। এটা একটি আত্মিক ঝঙ্কার– এর বাহ্যিক চাঞ্চল্যকর সমারোহ উদাত্ত-উন্মনা কলকোলাহল গোছের। বাহ্যিক রূপ প্রবাহ বর্ণাঢ্য, কিন্তু আত্মিক আবেদন চেতনাপ্রসূত, যা অধিক মাত্রায় ভাবসৃষ্টিধর্মী ও প্রেরণামূলক।

মিয়াবাড়ির বৈঠকখানা থেকে সামনের পাষাণ বাঁধা পুকুর ঘাটের দূরত্ব বিশ গজের কম নয়। পুকুরে যাওয়ার পুরো পথটিই সুপারি, মান্দার, শিমুল ইত্যাদি গাছের শাখা-প্রশাখার পল্লব-সজ্জিত অবদানে ছায়াঢাকা। স্কুল থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাস্টার সাহেব বৈঠকখানার বারান্দায় একটি চেয়ার পেতে বসলেন। কতকগুলি বুলবুলি ফুলের মৌ পিয়ে এ ফুল থেকে ও ফুলে ফুরুৎ-ফারাৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর কলকণ্ঠে তাদের ভাষায় ভাব বিনিময় করছে। দেহ জুড়ানো দক্ষিণা বাতাসে যখন অন্তরের উষ্ণতা দমিত হল, মাস্টার সাহেব সম্মুখের সারিবদ্ধ কুঞ্জের দিকে মনোযোগের সাথে তাকিয়ে থেকে নির্জন অধ্যয়নে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন।

মাস্টার সাহেবের একাগ্রচিত্ততা ভেঙ্গে গেল বৈঠকখানা ঘরটির টিনের বেড়ার সাথে শক্ত কিছুর আঘাতে যখন "খটাং" করে বেড়াটি শব্দায়িত হল। দৃষ্টিপাত করে তিনি বুঝতে পারলেন, কাঁখের কলসের সাথে বেড়ার টিনের মনোযোগ সৃষ্টিকারী ঘষাঘষি হয়েছে।

দেখতে ষোড়শী বটে। পদচারণে বয়সানুচিত ছন্দদোলা, চাঞ্চল্য— অন্তর লতিয়ে ওঠার স্নেহ-সিঞ্চনের আচ্ছন্নতা ডাগর চোখের ছলছল চাউনিতে। তনুর দোলনে হৃদয়কে প্রতিবেশী করার মায়াঞ্জন ছড়ানো ঘনিষ্ঠতার মোটেও অভাব নেই স্ফূর্তিময় চঞ্চল পদক্ষেপে। কস্তুরীঘন কেশগুচ্ছ মৃদুল হাওয়ায় দোলায়িত দোলনচাঁপার ভঙ্গীতে তিন ভাঁজ করে বিনিয়ে খোঁপা বাঁধা, ব্লাউজের উপরে পীঠের যে শূন্য জমিন তা চুমিয়ে দোল খাচ্ছে দোলন খোঁপাটি! আঁচল যেন শাসন মানছে না, নির্বিনীতের মত উড়ছে বাতাসে, আছাড় খেয়ে পড়ছে পীঠে ও কোমরে। মিয়াবাড়ির মেঝ মিয়ার মেঝ মেয়ে। পাষাণ বাঁধা পুকুরে

কলস কাঁখে জল আনতে যাচ্ছে, চলার ভঙ্গীতে যেন শ্রীরাধার মুরলীধারী শ্যামের সাক্ষাতের বিলাসী সৌখিনতা, ব্রজে বধুকুল গেলে যাবে কারণ কূলের প্রেমিক নাগর তো গোকুল রচনা করে ডাকছে।

বৈঠকখানার প্রায় বিশ গজ পিছনে বাড়ির আঙ্গিনা। বৈঠকখানা বিপরীতমুখী হওয়ায় বাইরের মানুষের দৃষ্টি বাড়ির ভিতরে পৌছায় না। বৈঠকখানায় একটি কক্ষ তৈরি করে তরুণ মাস্টার সাহেবকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। আর পুরো ঘরটিতে চৌকি বসিয়ে চাকর-বাকরেরা থাকে। বৌ-ঝিদের ব্যবহারের জন্য বাড়ির পিছনে পাষাণ বাঁধা ঘাটের আর একটি পুকুর আছে। তথাপি সে কলস কাঁখে বাইরের যে পুকুরে জল নিতে এল, সেটাতে বৌ-ঝিদের জল নিতে, হাত-মুখ ধুতে বা গোসল করতে আসা মিয়া সাহেবদের মানা।

তরুণী যখন কলস ভরে জল নিয়ে ফিরে এল, মাস্টার সাহেব তখনও চেয়ারে স্থির উপবিষ্ট। দৃষ্টি এবার তাঁর তীর্যক, অন্যদিকে সংস্থাপিত, অন্তরে নিমগ্ন ভাবাবেগ এবং অদম্য কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসা– এর নাম কি, শিক্ষা কতটুকু এবং কোন্ মিয়া সাহেবের মেয়ে!

বাঁশুরিয়ার বিরহ যেমন সুরের অনুরূপতা খোঁজে, আবেগ যেমন ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশের আনুকূল্য খোঁজে, তেমনি মাস্টার সাহেবের ঐ তিনটি প্রশ্ন নিজের খান্দানি, শিক্ষা বয়সানুচিত পছন্দকে হাতড়ে ফিরে খুঁজতে লাগল। এর কারণ, ষোড়শীর বারণকৃত পুকুরে অসময়ে গমন, তাও বৈঠকখানা যখন নির্জন-নিরিবিলি, মাস্টার সাহেবকে বাদ দিলে বৈঠকখানা যখন জনহীন নীরব গোরস্তানতুল্য। তাহলে কি তিনিই ষোড়শীল টার্গেট, আর তাই সে হরিণীচঞ্চলা!

তরুণী মাস্টার সাহেবের সম্মুখে এসে কাঁখের ভরা কলসটি কোমরের পাশ বদলিয়ে নিল দাঁড়িয়ে! ডালিমসুদ্ধ আচমকা হাওয়ায় যেমন শাখা নড়বড়িয়ে ওঠে, তার সম্পূর্ণ দেহটি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল কলসের কাঁখ বদলাতে। পদ্মরাগ ঠোঁট দুটিতে যেন প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রলাপভাষণ, চাউনিতে মৌখিক মুখরতা, তবে তার দৃষ্টির মনোযোগে তীরবেঁধা লক্ষ্যভেদ, যা প্রেমিক পুরুষের অন্তরে মুহূর্তে বুদ্ধিভ্রম, বক্ষক্লেশ শ্বাসায়িত উষ্ণতার একটা ভাবব্যঞ্জনা ঘটাবার মত শুদ্ধ শাসন! চঞ্চল পদভরে শাড়ির আঁচল উড়াতে উড়াতে, খোঁপায় দীঘির জলের তরঙ্গের দোলন ছড়ায়ে এবং ফুটন্ত তনু এলিয়ে-দুলিয়ে চলে গেল তরুণী। চলে গেল দৃষ্টির অগোচরে, কিন্তু ছন্দ-হিল্লোলিত চলার সবটুকু লহরী-লালিত্য দক্ষিণা বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরপাক খেতে লাগল মাস্টার সাহেবের সম্মুখে এবং হৃদয়কুঞ্জে আন্তরিক মোকদ্দমার অভিযোগ উপস্থাপিত করে। হায় রে বেচারা!

নারীর এটা মূলধন সমর্পনের কৌশল, তবে এটাতে অভিনবত্বের কি-ই বা আছে। নতুন পুরুষের কাছে নতুন লাগাটাই স্বাভাবিক। প্রভাতের শুভ্র সমুজ্জ্বল হাসি চিরন্তন প্রকৃতিলীলা, যা নতুন স্থানে পুরাতন চোখেও নতুন লাগে।

মাস্টার সাহেব চেয়ার থেকে উঠে ঘাটে হাত-মুখ ধুতে চলে গেলেন।

মাস্টার সাহেবের মনে একটা আমোদিত কল্পনার সৃষ্টি হল। কেমন যেন একটা বেদনাখসা গন্ধ তিনি পরিবেশের প্রতিটি পদার্থের অণু-পরমাণুতে স্থিত বলে অনুভব করতে লাগলেন। আজ এ নতুন পরিবেশের সমস্ত উদাসীনতায় একটা সিক্ত মায়ার প্রলেপের আস্বাদিত কিন্তু সাত্বিক মধুরতা খুঁজতে লাগলেন তিনি, যা মন-মানসকে সর্বদা আকর্ষিত ও চকিত-চঞ্চল করে রাখে। অন্তর জুড়ে যেন একটা মর্মভেদী অভিমানের

নালিশ তবলা বাজাতে লাগল তিনটি আর্তকাতর প্রশ্ন নিয়ে– এ কার মেয়ে, শিক্ষাই বা কি এবং নামটিই বা কি।

মাস্টার সাহেবকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে নিযুক্ত করেছেন মেঝ মিয়া সাহেব। বড় মিয়ার ছেলেমেয়েরা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সুতরাং তাদের জন্য হাইস্কুলের একজন শিক্ষককে নিযুক্ত করাটা তো মোটেও যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিন্তু মাস্টার সাহেব কার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, সে কথা আজ এক মাসেও স্পষ্টরূপে জানেন না। শুধু জানেন, তিনি মিয়াবাড়ির গৃহশিক্ষক।

দারুণ তৃপ্তি নিয়ে রাতের খাবার খেতে বসলেন মাস্টার সাহেব। মলা মাছসহ বেগুনভাজি, বাতেমা কচুর তরকারি এবং মশুরের ডাল। গামলা থেকে প্রথম বাড়া ভাত নিয়ে বেগুন ভাজি দিয়ে খেয়ে শেষ করলেন তিনি। দ্বিতীয় বাড়া ভাত গামলা থেকে নিতে ভাতের গাদার ভিতর ঢুকাতে চামুচ যেন বাধাপ্রাপ্ত হল। তিনি চামুচ আলগিয়ে একটু দূরে বসিয়ে চাপ দিয়ে উঠাতে দেখেন, বোয়াল মাছের শিরাদেশীয় বড় একটি টুকরো বেরিয়ে এল! অবাক ও চমৎকৃত হবার মত চালাকি বটে। আজ এক মাসে তো এমনটি হতে তিনি কোনদিনও দেখেননি। তিনি আনন্দিত হলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, পুকুরগামী ষোড়শীই এ খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। সে নিশ্চয়ই মেঝ মিয়ার মেয়ে, কারণ মাস্টার সাহেব এবার ভাবলেন, তিনি মেঝ মিয়ারই গৃহশিক্ষক। মাছের টুকরোটি তিনি ভাতের মাঝখান থেকে আবিষ্কার করায় তাঁর এ ধারণার সৃষ্টি হল। ধারণাটি নির্ভুল বটে!

পরের দিন ঠিক ঐ সময়ে মাস্টার সাহেব বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন। তরুণী হেলে-দুলে পূর্ববৎ চঞ্চল পদভরে পুকুরের জলে গেল। আজ চরণ চলায় তার অধিক ছন্দ ও দ্রুততা। কারণ, সে জানে, তার প্রতি মাস্টার সাহেবের একটা ইচ্ছাকৃত আগ্রহ ও মনোযোগের সৃষ্টি হয়েছে। পুরোটা পরিবেশে কেশের মাখা গন্ধরাজ তেলের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেল কলস ভরে নিয়ে। সে যেন জানে, আজ মাস্টার সাহেবের ব্যাকুলতা কিসে এবং কেন। তবে আজ দুজনাতে আসতে ও যেতে দুইটিবার মায়াবী ও রসানন্দের চোখাচোখি হয়েছে, এই যা! এ চোখাচোখিতে তিনি ষোড়শীকে আপন করে পাবার জন্য প্রয়াসী হয়ে উঠলেন। তিনি চুম্বক-বল দ্বারা আকর্ষিত।

রাতে মাস্টার সাহেব খেতে বসলেন। একটি মেলামাইন পিরিচের উপর দৃষ্টিপাত করে তাঁর চক্ষুদ্বয় স্থির। এ কি, বড় বড় মলা মাছগুলি দিয়ে "শিক্ষা" শব্দটি সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে। তিনি অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। নানান জিজ্ঞাসা ভিড় জমাল তাঁর মাথায়। বুদ্ধির জট যখন খুলে এল উড়ন্ত ঘুড়ির সুতোর পাকের মত, তখন তিনি গুনে দেখেন, মাছের সংখ্যা বারোটি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ষোড়শীর শিক্ষাসীমা বারো অর্থাৎ রোমান সংখ্যায় দ্বাদশ বা ইংরেজীতে ইন্টারমেডিয়েট!

আজ তৃতীয় দিন। তরুণী পূর্ববৎ কলস কাঁখে পুকুরজলে বের হয়েছে। মাস্টার সাহেব আজ চেয়ারে উপবিষ্ট নন, দাঁড়ানো। তরুণী যখন পথের অর্ধেক চলে গেল, মাস্টার সাহেব দৃষ্টিপাত করলেন, তরুণীর নৃত্যময় সর্ব অঙ্গে। তরুণী খোঁপার গ্রন্থিতে ছোট ছোট একই জাতীয় অসংখ্য ফুলের মালা বা জরী তৈরি করে খারুর মত পেঁচিয়ে নিয়েছে। চলার গতি তার একান্তই স্বাভাবিক। কলস ভরে ফিরে চলে গেল তরুণী। কিন্তু আজ কোন হাসি, চোখাচোখি বা চরণ ফেলতে চমকের সৃষ্টি করা– কিছুই দেখাল না সে। কারণ, আজ পূর্ণ পরিচয়ের শেষ পর্ব। মাস্টার সাহেবের কৌতূহল সৃষ্টি হতে সময় লাগল। তরুণী যখন ফিরে যায়, তখন তিনি বিস্ফারিত চোখে দৃষ্টিপাত অব্যাহত

রাখলেন তরুণীর উপর। এবার তিনি হঠাৎ দেখলেন, তরুণীর খোঁপায় পেঁচানো মালাটি খোঁপার গ্রন্থিতে নেই! সে উঠান, পেরিয়ে ভিতর বাড়িতে অন্তর্ধ্যান হওয়া মাত্রই মাস্টার সাহেব দ্রুত পুকুর-ঘাটে গিয়ে উপস্থিত। দেখেন, মালাটি জলের উপরের সোপানে গোলাকারে গুছিয়ে রাখা। তিনি সাগ্রহে হাত দিয়ে তুলে নিলেন সেটা। ফুলের পরিচয় পেলেন, এ মালা ডালিয়া ফুলের। সুতরাং, ষোড়শীর নাম ডালিয়া!

প্রলয়-শিখা

কাব্যে শব্দগুচ্ছ মাল্য-খচিত হয়, যা ছন্দবদ্ধ রীতিতে এমনভাবে স্তবকিত হয় যে শিল্প-সৌন্দর্য প্রদর্শন ছাড়াও সমাজলগ্নতা ও তাত্ত্বিক কৌলীন্য প্রাপ্তির আলঙ্কারিক অপূর্বত্বে শালিত ও শাসিত হয়। কোন নতুন বৈশিষ্ট্যের সত্তা শব্দ-প্রয়োগ কৌশলকে শুধু নতুন অর্থব্যঞ্জনার সৌরিমাই দান করে না, শব্দের তীর্যক তথা ইঙ্গিতবাহী নির্দেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সচ্ছন্দ কিন্তু সজ্ঞান অভিপ্রায়ের অভিযোজন আনয়ন করে। অলঙ্কার বিন্যাস বা কুলীন কাব্যরীতির আতিশয্য সজ্ঞান মানসকে পঠন-রসে সুধায়িত করতে পারে ঠিক, কিন্তু তাতে অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ প্রকট হয় এবং মনস্তাত্ত্বিক কল্পনাস্রোত বাধাগ্রস্ত তো হয়ই, বাচন-ভঙ্গী তথা কাব্যভঙ্গী ভাবকল্পনাকে পরিহার করে বস্তুকল্পনাকে আঁকড়ে ধরে বেশি; সৃষ্টি হয় গতানুগতিক রীতিধারার অনুসরণ ও অনুরণন।

নজরুলের সম্পূর্ণ নতুন, বিচিত্র, বিস্ময়কর এবং অনতিক্রম্য বৈশিষ্ট্য খানিক গতিচঞ্চল হলেও স্বয়ংক্রিয় ধারার পূর্ণ পরিচয় বহন করছে তাঁর "প্রলয়-শিখা" কাব্যগ্রন্থ, যেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ প্রয়োগ পাঠককে করে গুলীবিদ্ধ, বাণ-বেঁধারূপ আহত এবং হাঁপানী রোগীর মত কষ্টসিদ্ধ শ্বাসায়িত। ছন্দের গতি তূরীয়ানন্দ-তাড়িত, বোধন আন্দোলিত এবং কল্পনা বিদ্যুৎ-চকিত। এ কারণে বাংলার সকল কবির কাব্যে গতানুগতিকতার কম-বেশি দুষ্টছাপ আছে, কিন্তু নজরুল-কাব্য এ ত্রুটির জগতে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও নিষ্কাশিত।

কাব্যের বাণী ও ভাবকল্পকে সমরাস্ত্রে উন্নীত করতে হলে আষাঢ়ে বৃষ্টির রিমঝিম ছন্দ যথেষ্ট বা উপযুক্ত নয়, বরং বহু উঁচু হতে নির্গত যৌবনচঞ্চলা ত্রিভঙ্গী ঝর্ণার কশাঘাতক্ষীপ্ত দাম্ভিক ও ভৈরবনাদী ছন্দ প্রয়োগ করা পৌরুষিক আস্ফালন বটে, যা হৃদয়-প্রদেশকে করে প্রকম্পিত এবং বস্তুকল্পকে সৃজনশিল্পিত করত অন্তরাশ্রয়ী স্বপ্নপ্লাবনকে করে কূলছাপিত। মহাকবি নজরুল বেণীতির্যক ভাষার অবতারণা করেছেন তাঁর অগ্নিবীণা কাব্যে, তার কালজয়ী মিলন-মোহনার সৃষ্টি করেছেন ভাঙার গান বিষের বাঁশির পথ ঘুরিয়ে প্রলয়-শিখা কাব্যগ্রন্থে। একক ও অনতিক্রম্য যে সত্তা নিয়ে কারো পক্ষে গুরুগিরি করা সম্ভব নয়। এজন্য "প্রলয়-শিখা"র নজরুলের আবির্ভাবের পর শুধু বাংলায় কেন, সারা ভারতের সাহিত্য-সমাজে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল এই বলে যে বাংলা কাব্যসাহিত্যে মুসলমানদের স্থায়ী এবং গর্ব করার মত মৌলিকত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হল। নজরুলের দৈশিক, তাত্ত্বিক বৈশ্বিক ভাবের পূর্ণ সম্মোহন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থে। এও প্রতীয়মান হয়েছে যে, তাঁর প্রতিভা বিশাল, বিস্তৃত, অদম্য এবং উভয় কূলকে প্লাবন ছাপিত করার মত বিস্ময়কর। প্রলয়শিখার যুগে আমরা দেখেছিলাম, তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা বৃষ্টিঝরা, ধারা ঝরানোর ছন্দে উদ্বেলিত ও প্রকম্পিত।

শুধু প্রলয়-শিখার কবিতায় কেন, তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে শিশিরের স্বচ্ছতা, ঊষার অরুণ ঝলক, বসন্তফুলের সৌরভ বর্তমান, কিন্তু বোধন সৃষ্টিতে মৃণালের কশাঘাত

আছে– সে সৃষ্টি তাঁর রাজনৈতিক, সাম্যবাদী, প্রেমাত্মক কিম্বা দর্শনাশ্রিত হোক না কেন। প্রলয়-শিখার কবিতায় তিনি মৌলবাদীদেরকে মৌ-লোভী, পুরোহিতদেরকে পেটুকপেটা এবং শাসককে শ্মশান রক্ষার অযোগ্য বলে ক্ষীপ্ত হস্তে চাবুক মেরেছেন! এই কশাঘাতের কৌশল হোমার রচিত ইলিয়াড কাব্যের ট্রয় নগরী ধ্বংসের বীররস মিশ্রিত কাব্যিক আস্ফালনের চেয়ে ন্যূন নয়। সবচেয়ে বড় কথা, শুধু ব্রিটিশ সরকারের শোষণরূপী মুখোস তিনি প্রলয়-শিখায় সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেননি,– সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিদ্রোহের সর্বাত্মক ঘৃণিত অপরাধমূলক চরিতার্থতাকে অনাদিকালের পাঠ্যশালায় ব্যক্ত করতে সমর্থ হন।

পৃথিবীর বহু প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকও তাঁদের যুগকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করতে পারেননি তাঁদের কাব্যিক চিত্রপটে; তাঁদের সমকালীনতার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি তাঁদের কাব্যে হয়ে ওঠেনি। মনে হয়, পৃথিবীতে প্রথমতঃ নাট্যকার শেক্সপিয়র ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকে কাব্যের মাধ্যমে "যেথায় সূর্য অস্ত যায় না" বিশাল ব্যাপ্তি লাভে গতিদান করেন। আর দ্বিতীয়তঃ বাংলার মহাকবি নজরুল যুগের পূর্ণ দাবীকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজে অনাদিকালের জ্ঞানের অক্ষয় প্রন্থাগারে পরিণত হয়েছেন। একজন ইংল্যাণ্ডবাসীকে "বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নেবেন না শেক্সপিয়রকে নেবেন" বলে প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই তিনি অকপট উত্তর দেবেন– শেক্সপিয়রকে। আর ভারতের সেই দুর্দিনে যদি প্রশ্ন করা যেত যে, মহাকবি নজরুলের আবির্ভাব কতটুকু লাভজনক? যে কোন ভারতবাসী উত্তর দিতেন– এই সেই প্রতিভা, যাঁর আবির্ভাবের অভাবে মহাভারতের স্বাধীনতা কমপক্ষে অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে যেত। নজরুল মহাকাল পেরিয়ে রক্তের স্রোতে বহমান থাকবেন মানব-গোষ্ঠীর অস্তিত্বে এবং থাকার যোগ্য। কারণ, ইংল্যাণ্ডের কেবিনেটে সেদিন মহাকবি নজরুলকে নিয়ে যে দিনব্যাপি মজলিসী বৈঠক হয়েছে তাই তার প্রমাণ। এর চেয়ে বড় দৈশিকতা বা বৈশ্বিকতা ভারতের অন্য কোন কবির ভাগ্যে ঘটেনি।

ঈমানের সান

মাগরিবের নামাজের সময়ের পরিসর অতি অল্প। অন্যান্য নামাজের সময়ের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। ভোররাতে আমাদের উঠতে দেরী হয়, এজন্যই ফজরের নামাজের সময়ের ব্যাপ্তি সামান্য বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

নামাজী মুসলমানগণ মসজিদে মাগরিব নামাজ পড়ার জন্য সমবেত হয়েছেন। ইমাম সাহেব এলেই নামাজ শুরু হবে। কিন্তু ইমাম সাহেব আসার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এদিকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় ক্বাজা হবার যোগাড়। মুসল্লীগণ প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়লেন।

কেউ কেউ মনে করলেন যে, ইমাম সাহেব হয়তো আজ অসুস্থ। তিনি নামাজ পড়াতে আসতে পারবেন না। কিন্তু নির্ধারিত ইমামের এজাজত ব্যতীত অন্য কেউ ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতে পারেন না। ইসলামে এমনও মাসায়েল আছে।

মুসল্লীগণ মুয়াজ্জিন সাহেবকে নামাজ পড়ানোর অনুরোধ করতে লাগলেন। তবে নির্ধারিত ইমামের অপেক্ষায় থেকে যদি ফরজ নামাজ ক্বাজা হতে বসে তখন মুসল্লীগণ এক জনকে (এক্ষেত্রে মুয়াজ্জিনের অধিকার বেশি) ইমাম মনোনিত করে নামাজ আদায় করতে পারেন। এটাও ইসলামের অনুমোদিত বিধান।

সুতরাং মুয়াজ্জিন সাহেব অনুমতি পেয়ে ইমাম স্বরূপ দাঁড়ালেন। আকামত পাঠ শেষ হল। "আল্লাহু আকবার" শব্দে তাকবীর তাহ্‌রিমা বাঁধা হবে। সবাই কান পর্যন্ত দুহাত তুলে নিয়ত সমাপ্ত করতে প্রস্তুত।

মসজিদের দরজা হতে ইমাম সাহেবের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল– দাঁড়ান, আমি এসেছি। নামাজ পড়ানো আমারই দায়িত্ব।

মুয়াজ্জিন সাহেব সরে গিয়ে নিজের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। ফরজ তিন রাকাত নামাজ শেষে ইমাম গাজ্জালী (রহ.) দাঁড়িয়ে বললেন, মুসল্লী ভাইসব, সুন্নত নামাজের পর আমার একটি আকুল মিনতি শুনে যাবেন।

নামাজ সমাপ্ত হল। মুসল্লীগণ আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছেন। হাজার হাজার মুসল্লী। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) দাঁড়ালেন। আর্দ্রকণ্ঠে মুসল্লীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা নামাজের জন্য এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কষ্ট পেয়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন। এজন্য আমি সবিনয়ে মাফ চাইছি। আপনারা অনুগ্রহ করে সর্বান্তকরণে আমাকে মাফ করে দিন।

ইমাম সাহেব মাফ চাওয়ায় অনেকে দারুণ লজ্জা পেলেন এবং দুঃখিত হলেন। তাঁদের মত সামান্য মানুষের কাছে আল্লাহর একজন এত বড় অলি মাফ চাইছেন, এটা তো মুসল্লীদের বে-আদবি।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করে বসলেন, ইমাম সাহেব! আপনার মাফ চাওয়ার রহস্যজনক কারণের হেতু আমরা জানতে পারি কি? জানতে পারি কি, আপনার নামাজে আসতে কেন দেরী হয়েছে?

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রহস্য বলতে লাগলেন, দেখুন, আমি জোহরের নামাজ পড়াতে আসার পূর্বে ফজর থেকে জোহরের সময় পর্যন্ত যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তা হিসাব করে আল্লাহর কাছ থেকে মাফ নিয়ে তবেই ইমাম স্বরূপ জোহরের নামাজে দাঁড়াই। আসরের নামাজ পড়াতে এলে জোহর থেকে আসরের নামাজের সময় পর্যন্ত করা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করে নিয়ে নিজে নিষ্কাশিত ও নিষ্কলুষ হয়ে আসরের নামাজে ইমামতিতে দাঁড়াই। এভাবে প্রতিদিন ইমামতি করি।

ঐ লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি আজ হিসাব-নিকাসে কোন গরমিল হয়েছে?

ইমাম সাহেব বললেন, হাঁ হয়েছে বৈকি। অজু করে নামাজে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। বিবিকে বললাম, তুমি নামাজ পড়ে নিও। আমি মসজিদে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাতে যাচ্ছি।

বিবি বলল, দাঁড়ান, আজ নামাজে গেলে আপনার ইমামতি কবুল হয় কি না, সন্দেহ আছে।

আমি বললাম, কেন, আমার অপরাধ?

বিবি বলল, আপনার একটি মুরগী প্রতিবেশীর মাঠের শস্যদানা খেয়েছে। আমি মাফ চেয়েছি, তাঁরা আমাকে মাফ করেননি। তাঁরা শস্যদানার ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। আপনি ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে নামাজে যান। নইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আপনার নামাজের জন্য আরশে সুপারিশ করবেন না।

আমি দেখলাম, তখনি প্রায় নামাজের সময় হয়েছে। প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলাম। সবিনয়ে মাফ চাইলাম, তাঁরা মাফ করতে নারাজ। কিন্তু মুরগীটা তাঁদের কতটুকু

শস্যদানা খেয়েছে তাই বা কিভাবে পরিমাপ করি! তাঁদের দাবী চূড়ান্ত হল এইভাবে যে, মুরগীকে ওজন করে এক চতুর্থাংশ ওজনের পরিমাণ শস্যদানার বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। তা-ই করে নামাজে এলাম। এতেই দেরী হয়েছে। আমাকে মাফ করবেন।

ঐ লোকটি বললেন, ইমাম সাহেব! তাহলে আমরা নিশ্চিত যে, আপনার ইমামতি কবুল হয়েছে।

ইমাম গজ্জালী (রহ.) এ প্রশ্নের জবাব কিছুই দিলেন না। মুসল্লীগণকে তিনি বললেন, আপনারা এখন যেতে পারেন।

পথে যেতে যেতে নানান জন এ বিষয়ে নানারূপ মন্তব্য করতে লাগলেন। এরকম আলোচনা সমালোচনা সাধারণ ঈমানদার লোকদের পক্ষে করাটা স্বাভাবিক।

যে লোকটি ইমাম সাহেবকে প্রশ্নগুলি করেছেন, তিনি ঐ রাত্রে বাস্তব জীবনের মত স্বপ্নে দেখলেন– স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবিয়া দোজখের দ্বাররক্ষককে দোজখের দরজা খুলে দিতে বললেন। তাই করা হল। ইমাম গজ্জালী (রহ.) কে হাবিয়া দোজখের দরজায় দাঁড় করানো হল। তাঁকে "আল্লাহু আকবার" শব্দে চোখ খুলে তাকাতে বলা হল। ইমাম সাহেব "আল্লাহু আকবার" শব্দ উচ্চারণ করে চক্ষুদ্বয় খুলে দোজখের লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। হাবিয়া দোজখ ভীত-সন্ত্রস্তের মত নিভে যেতে লাগল!

রাসূল (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে দুরন্ত হাবিয়া! তুমি নিভে যাচ্ছ কেন?

উত্তর এল, ইমাম সাহেবের ঈমানের ভয়ে।

কবি ও কাব্য

কবি সৌন্দর্যের পূজারী। কাব্য জীবনামৃত পরিবেশনার সাকীর হাতের রঙীন পেয়ালা যাতে হৃদয়-মথিত, অভিজ্ঞতালব্ধ ও আকণ্ঠ-প্লাবিত কাব্যিক রস ছন্দবদ্ধ প্রণালীতে নিসৃত হয় এবং ভাবকল্প স্তবকাকারে পুষ্পাক্ষের উপরে ফুল-পাঁপড়ির মত গ্রন্থিমূলে সুগ্রোথিত হয়। কাব্যের বাণীতে থাকে সমৃদ্ধ ভাব ও চিন্তা-চেতনার সিন্ধু-মন্থন। সমাজ স্পর্শের মানসিক ও জাগতিক প্রথালালিত শৃঙ্খলন বা স্খলিত অবচৈতন্য যাকে আত্মিক সংবেদন ও জনমূলীয় সংলগ্নতার বিচারে বিশ্লেষিত করে লালনসাধ্য আত্মীকরণ প্রবিষ্ট করত রসায়িত করতে হয়।

কাব্যের প্রতিটি বাণী হবে চিন্তা-ভাবনার ভ্রূণকোষ। সূক্ষ্ম রসবোধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশের মাধ্যমে কন্টকজড়িত হলে কাব্যরসের প্রস্রবণ আনে অনাবিল আনন্দ ধারা; কাব্যের প্রতিটি স্তবক একটি পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের গ্রন্থি-বৃন্তে দল-পাঁপড়ির মত গুচ্ছিতাকারে বিন্যস্ত হতে হবে যাতে পাঠকের কল্প-বায়ুর মৃদু সঞ্চারণে দলগুচ্ছ উন্মুক্ত হয় এবং ভাব-সৌরভ মুক্তি লাভ করত হৃদয়পুঞ্জে স্বপ্নসুখের বিলোল স্পর্শ এনে দেয়।

কাব্যের বাণী যথাসম্ভব আভিধানিক অর্থশম্ভূত না হয়ে পারিপার্শ্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিতবাহী বা ভাব-স্পর্শী ও প্রতীকধর্মী হলে রস-স্রবণের উৎসমূল অধিক সম্প্রসারিত হয় যাতে যুগ-প্রেরণার মানসিক হিন্দোল সৃষ্টি ছাড়াও দূর-দর্শন সৃষ্টিতে সার্থক হয় এবং কবির উচ্চারণকে অস্তিত্ব লাভে দীর্ঘায়ু দান করে। তখন গীতি-কবিতার কাব্যরস প্রেম-বিরহের আর্তনাদে পরমার্থময় শাশ্বত হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের পুলক-প্লাবনের ধারায় স্বপ্ন জগতকে কূল-ছাপিত করে এবং গীতল-ব্যঞ্জনা প্রকম্পিতভাবে বারংবার হৃদয়-গহ্বরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। তখন কাব্যিক অলঙ্করণ শুধু সৃজন-শিল্পিতই হয়

না; ভাব পরাশ্রয়ী না হয়ে অন্তরাশ্রয়ী হয়– স্বাপ্নিক গতিবেগ হয় বিজুলীবাহিত; ভাষার শিল্পিত সৌকর্যে ভাব হয় গুণ্ঠিত কিন্তু ললনা-শোভিত ভূষণ কাব্যকে করে কুসুম-সজ্জিত।

কাব্যের ছান্দিক ও শাব্দিক প্রয়োগ হবে মাল্যভূষিত, বধূগুণ্ঠিত এবং বেণীতীর্যক, অন্যথায় বাণীর স্বপ্নাবেদন দেহ থেকে দেহাতীতে গমনক্ষম হবে না। তীর্যক শব্দ প্রয়োগ বাস্তব পৃথিবীর অধরাকে মূর্ত-প্রতিবিম্বিত করে এবং অস্পর্শকে ইন্দ্রিয় দ্বারা না হলেও প্রাণস্পর্শী করে তোলে,– এটাই কাব্যিক উপলব্ধি। নির্মাণ-প্রকরণ যেমন অলঙ্কারের সৌধী-জ্যোতির স্ফূরণ ঘটায়, সুনির্বাচিত শব্দসম্ভার ভাবানুগ ও বিষয়ানুগ গাম্ভীর্য প্রদানে সমর্থ হয়। ভাবানুগ ও বিষয়ানুগ তারল্য বর্জনকার্যে বাংলাকাব্যে রূপক পদবাচ্য আনুপূর্বিক উপমা, বৈচিত্র্যময় উৎপ্রেক্ষা এবং ভাব-সান্নিধ্যকামী সমাসোক্তি কাব্যকে শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণত করে। শিল্পসৃজন যেমন সৃষ্টিশীল প্রতিভার নিরবচ্ছিন্ন সাধানাপনার ফসল তেমনি শিল্পীকে সৃজনশীল চর্চায় হতে হয় বাগ্মীচতুর ও নীরলস কর্ষণশীল।

অধুনা গীতিকাব্যের মূল সঞ্জীবনী-সুধা বা প্রাণরস হল বিরহের লালন, সৌন্দর্যের সন্ধান এবং মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রতকরণ; এর সবগুলি সাত্ত্বিক অনুরণন সৃষ্টির মাধ্যমে কবিসত্তার মৌলিকত্ব উদগাতকরণের দাবী রাখে। এজন্যই প্রেম, কল্পনা সৃষ্টির প্রবণতা, মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান, হৃদয়-প্রকৃতির রহস্যোদঘাটন, ধর্মীয়-সামাজিক বৈফল্যময় স্থাপন যা বৈষম্যমূলক বিভেদ সৃষ্টির জন্য দায়ী তার অশোভনকে শোভন ও সুন্দর অভিযোজনে প্রতিস্থাপনকরণ প্রভৃতি পরম সত্যকে সুনির্বাচিত বাচনভঙ্গীতে কাব্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। গীতিকাব্যে সকল চিত্ত-চৈতন্যকে সাম্য ও মানব-প্রেমের সর্বজনগ্রাহ্য সন্ধিতে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়। গীতিকাব্যে জীবন-স্রোত উন্মুক্ত; বেদনার আতিশয্য হৃদয়কে বায়ু-নাড়িত পদ্মের মত উদ্বেলিত করে ভাবের সম্ভারে– নিঃসরিত করে কবি-প্রাণের সুধাময় অন্তর-মধু। মনে হয়, এ কারণেই গীতিকাব্যের গতিবেগ বিজুলী-তাড়িত, তা পৃথিবীর যে কোন ভাষায় রচিত হোক না কেন।

কাব্যে সূক্ষ্মরহস্যবোধের চেতনা ও রোমান্টিকতার বৈচিত্র্যময় চারিত্র্যকে সঞ্চারণশীল করতে হলে কবিকে নির্ঘাত মননশীল হতে হয়। কবির আত্ম-ভাবের বিস্তারণ উদ্দাম বা ধ্যানগম্ভীর প্রকৃতিস্থ যে কোন স্বভাব-গতিতে ঘটুক না কেন কৌতূহলবোধ ও অপ্রাপনীয়ের প্রতি চঞ্চলচিত্ত হওয়া ব্যতীত গীতিকাব্য ব্যঞ্জনাময় হবে না। কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করতে হলে কবিকে মনস্তাত্ত্বিক ও বিরহ-লালিত হতে হবে। কারণ অপ্রাপ্তির করুণ যন্ত্রণা কাব্যের আস্বাদ বর্ধন করে, অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শনাশ্রিত শাশ্বত সত্যকে উদঘাটনে সাহায্য করে এবং ভাষা হয়ে ওঠে আবিষ্কারধর্মী। অতৃপ্তির হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয় হৃদয়ের গভীর প্রদেশে। কবি আবিষ্কারধর্মী হওয়া ব্যতীত প্রবল কিন্তু গম্ভীর উচ্ছ্বাস, মান-অভিমানের বৈকুণ্ঠগামী বেদনাময় কিন্তু রমণীলজ্জ আর্তনাদ বা ভীম-পৌরুষিক আস্ফালন সৃষ্টি করা অসম্ভব ব্যাপার বটে।

যখন কবির নৈঃসঙ্গ পাঠককে স্বজনহারা একাকিত্বের শিকারে পরিণত করে, কাব্যে পাঠক আপন জীবনের অসহায়ত্ব বিম্বিত হতে দেখে পুষ্প-কাঁটার শিহরণে স্পন্দিত হয়, যেটাকে গীতিকাব্যে রোম্যান্টিকতা বলা হয়, তখন কবিকে যত বেশি সম্ভব নির্জনতা, একাকিত্ব এবং ভীতি প্রদর্শনের কৌশল গ্রহণ করতে হয়। উৎপাদিত হয় করুণ রস। জীবনের ব্যর্থতা, অপ্রাপ্তি এবং অবাঞ্ছনীয়তা রস-স্রবণের ফল্গুধারাকে অকপট প্রবাহিত করে। কাব্য শেষ হয় কিন্তু লবণুমিশ্রিত আস্বাদ ওষ্ঠ্যপুটে আজীবন লেগে থাকে। এরূপ কাব্য পাঠকের কাছে কোনদিন পুরাতন, স্বাদহীন ও রুচিহীন বোধ হয় না। অধরা